Vol. 39 | No. 2 | 1996

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

লৌকিক ছড়ার রূপ ও গঠন-প্রকৃতি

Volume	39
Issue	2
Year	1996
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Wakil Ahmed
Published online	February 1, 1996
DOI	10.62328/sp.v39i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v39i2.1
Pages	5-29
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

লৌকিক ছড়ার রূপ ও গঠন-প্রকৃতি

ওয়াকিল আহমদ

'ছড়া' লোকসাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখা; এর প্রচারও সর্বাঞ্চলীয়। বাংলার এমন একটি ঘর নেই, যেখানে দু'-দশটি ছড়ার প্রচলন নেই। ছড়ার অন্তরের ও বাইরের সত্তা আছে যার সমন্বয়ে ছড়ার নিজস্ব পরিচয় ফুটে ওঠে। ভাব, ভাষা, ছন্দ, রস, রুচি, রূপ, শৈলী মিলে ছড়ার স্বতন্ত্র ভুবন রচিত হয়েছে। লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার সাথে ছড়ার এসব উপাদানগত মিল নেই। কথা, গাথা, গান, ধাঁধা, মন্ত্র, প্রবাদ ইত্যাদি স্বতন্ত্র গুণেই স্বতন্ত্র শাখা। ছড়ার নিজস্ব ছন্দ আছে যা অন্য শাখার নেই; ছড়ার ছন্দ মন্ত্র, বচন, ধাঁধা এমন কি, লোকসঙ্গীতকেও প্রভাবিত করেছে। শ্বাসাঘাত প্রধান স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত ছন্দ 'ছড়ার ছন্দ'। চার মাত্রা দ্বারা পর্ব গঠিত হয়; কারণ প্রতি পর্ব-সংখ্যা দুই থেকে চার পর্যন্ত বিস্তৃত। পর্বের প্রথম স্বরে ঝোঁক, অন্ত্যমিল, ধ্বনি-স্পন্দন, দ্রুত লয় ইত্যাদি মিলে এক মনোমুগ্ধ, চিত্ত-চাঞ্চল্যকর, আনন্দময় ভুবন রচনা করে। কাহিনী বলা হয়, ধাঁধা ধরা হয়, গান গাওয়া হয়, মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, কিন্তু ছড়া আবৃত্তি (recite) করা হয়। একে লৌকিক ভাষায় 'ছড়া কাটা' বলে। চলতি রীতির ছোট ছোট বাক্য দ্বারা ছড়ার চরণ গঠিত হয়। ভাষা প্রধানত চিত্রধর্মী, তবে বর্ণনাধর্মী ও প্রতীকধর্মী ভাষাও ছড়ায় ব্যবহৃত হয়। সহজ, সরল প্রকাশক্ষম ভাষা সাধারণ মানুষ অনায়াসেই বলতে পারে; শিক্ষিত কবির তা অনায়ত্ত। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "সহজ কথা যায় না বলা সহজে।" পল্লী কবি এই আয়াসসাধ্য কাজটি সহজ ভাষায় অতি সহজেই সম্পন্ন করেন। ছড়ার মূল রস বাৎসল্য রস, তবে করুণ, রঙ্গ-ব্যঙ্গ রসেরও ছড়া আছে। কিছু কিছু মধুর ও ভাব রসের ছড়া আছে; ব্রতাদি ছড়ায় ভক্তিরসের সন্ধান পাওয়া যায়। স্নেহ, আদর, মমতা, প্রীতির স্পর্শ দিয়ে ছড়া রচিত হয়েছে। শঙ্খের ভেতর যেমন সমুদ্রের কল্লোল-ধ্বনি শোনা যায়, ছড়ায় তেমনি জাতির হৃদয়ের স্পন্দন শোনা যায়, আর উত্তাপ অনুভব করা যায়। ছড়ার ভাবজগৎ প্রায় অশ্লীলতা মুক্ত; তবে কিছু গ্রাম্যতাও আছে। প্রধানত ছড়ার ভাব শোভন, রুচিসম্পন্ন ও সর্বজনগ্রাহ্য। ব্যঙ্গমূলক ছড়া নৈর্ব্যক্তিক বলে আঘাতের তীব্রতা এতে প্রকাশ পায় না, কৌতুক ও রঙ্গ রসই প্রাধান্য পায়।

ছড়ার এ যেমন ভাব-ভাষা-রস-রুচি-ছন্দের কথা তেমনি ছড়ার রূপ (form), শৈলী (style) ও গঠন-প্রকৃতির (structure) কথা আছে। এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য, ছড়ার এই রূপ-শৈলী-গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা। গভীর ভাবে লক্ষ করলে বুঝা যায়, ছড়ার যেমন বাইরের রূপ আছে, তেমনি অন্তরের রূপ আছে। বাইরের রূপটি রঙে-রসে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু অন্তর-কাঠামোটি অপরিবর্তিত থেকে যায়। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে নোয়াম চমস্কি (Noam Chomosky) কথিত surface structure ও deep structure-এর সাথে এর যোগসূত্র আছে। এ-সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। বস্তুত নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ছড়ার এ-বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা হবে।

সাধারণত চতুর্দল বিশিষ্ট দুই পর্ব থেকে চার পর্ব পর্যন্ত চরণের আলম্বিক (horizontal) এবং দুই চরণ থেকে আট-দশ চরণ পর্যন্ত ছড়ার ঔলম্বিক (vertical) ব্যাপ্তি। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল :

(১) পদ্মা নদি তি-তি।
জামাই আলো নিতি॥

(২) ধন ধন ধনিয়ে,
কাপড় দেব বুনিয়ে।
তাতে দেব হীরের টোপ,
ফেটে মরবে পাড়ার লোক॥

(৩) ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো,
বর্গী এলো দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে,
খাজনা দেবো কিসে ?
ধান ফুরালো, পান ফুরালো,
খাজনার উপায় কি ?
আর কটা দিন সবুর কর,
রসুন বুনেছি॥

(৪) আয় রে আয় ছেলের পাল,
মাছ ধরতে যাই।
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটল
দোলায় চেপে যাই।
দোলায় আছে ছ-পণ কড়ি
গুণতে গুণতে যাই।

এ নদীর জলটুকু টলমল করে।
এ নদীর ধারে রে ভাই,
বালি ঝুর ঝুর করে।
চাঁদ মুখেতে রোদ লেগেছে,
রক্ত ফুটে পড়ে॥

চরণ, পর্ব, অন্ত্যমিল, ছন্দ, পরিধি ইত্যাদি বুঝাবার জন্য এগুলো উদ্ধৃত হয়েছে। ১ নং ছড়ায় সমান মাপের দুই চরণে একটি করে পূর্ণ ও একটি করে অপূর্ণ পর্ব আছে। ২ নং ছড়ায় অসম মাপের চারটি চরণ আছে। ছড়া দুটি ক্ষুদ্র, কিন্তু সম্পূর্ণ। ৩ নং ছড়ার চরণ সংখ্যা চার, পর্ব সংখ্যা চার। তিনটি পর্ব পূর্ণ এবং একটি অপূর্ণ পর্ব। চতুর্থটি, চতুষ্পার্বিক ছয় পঙক্তির ছড়া। ছড়াগুলো একটি স্তবকে বিন্যস্ত। একটি স্তবক হওয়ায় অবয়বগত একটি বন্ধনসূত্র লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে, একটি পূর্ণাঙ্গ বা আদর্শ ছড়ার তিনটি অংশ স্পষ্ট: (১) প্রথমাংশ : সূচনা (intorduction), (২) মধ্যাংশ বিস্তার (growth) ও (৩) শেষাংশ সমাপ্তি (ending)। মন্ত্রের ক্ষেত্রে এরূপ চারটি অংশ (parts) লক্ষ করা যায় : (১) সূচনা, (২) বিবরণ, (৩) প্রার্থনা (prayer) ও (৪) দোহাই (challange)।[১] ধ্রুপদ গানেরও চারটি অংশ: (১) ধুয়া, (২) অন্তরা, (৩) সঞ্চারী ও (৪) আভোগ। অবশ্য খেয়াল ও ঠুংরীতে স্থায়ী ও অন্তরা এই দুই অংশ বা 'তুক' থাকে।[২]

ছড়ার সূচনাংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ড. সুকুমার সেন বলেন, "ছড়ার প্রথম ছত্র রচনা হলেই যেন রচয়িতার দায়িত্ব শেষ, তারপর বাকিটা যেন আপনি গড়ে ওঠে।"[৩] ছড়ার সূচনার চরণ বা চরণ-পদ (জোড়-চরণ) চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। ছড়ার মূল বিবরণ (মধ্যাংশ) ও সমাপ্তি (শেষাংশ) প্রায় সম-মাপে, সম তালে ও সম-আঙ্গিকে রচিত হয়। নির্মলেন্দু ভৌমিক ছড়ার সঠিক সমীক্ষায় (rounded study) যে 'মৌলিক প্রতিসাম্য' (primary symmetry) ও সম্পূরক প্রতিসাম্য (Secondary Symmetry)-এর কথা বলেছেন, তাতে মৌলিক প্রতিসাম্য প্রকৃতপক্ষে ছড়ার এই সূচনাংশই।[৪] কাঠামোগত তথা রূপতাত্ত্বিক বিচারে উভয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য, যদিও ভাব বা বিষয়গত সম্পর্কটি সব ক্ষেত্রে অভিন্ন নাও হতে পারে। উদ্ধৃত ৪ নং ছড়ার "আয় রে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই।" চরণ দ্বারা ছড়া আরম্ভ হয়েছে। 'আয় রে আয়' ধরতাই শব্দ (catch word): সম্বোধনসূচক এরূপ শব্দ ছড়া সূচনা করার নানা কৌশলের একটি। এই চরণের 'মাছ' দ্বিতীয় চরণে পুনরুক্ত হয়ে উভয় চরণের সংযোগ রক্ষা করেছে। মাছ, জল, নদী, কূল, বালি ইত্যাদি সহচর-অনুচর শব্দ। মাছ ধরা, পায়ে মাছের কাঁটা ফোটা, নদীর জল টলমল করা, নদীতীরের বালি ঝুর ঝুর করা—

নদীকেন্দ্রিক চিত্র। দোলায় চড়া ও ছ-পণ কড়ি গোণা আপাতদৃষ্টিতে অসংলগ্ন মনে হতে পারে: কিন্তু এটিও কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত। পায়ে মাছের কাঁটা ফোটা কারণ (cause), দোলায় চড়ে গমন কার্য (effect) রূপে চিত্রিত হয়েছে। 'দোলা' বা পাল্কী এবং 'ছ-পণ কড়ি' ছড়াটিকে একটি বিশেষ যুগের সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক পটভূমিতে স্থাপিত করেছে। "চাঁদ মুখেতে রোদ লেগেছে, রক্ত ফুটে পড়ে" চরণটি ছড়াটিকে সমাপ্তি দান করেছে, কেননা, এরপর আর বক্তব্য নেই। মাছ ধরা, দোলায় চড়া, দোলায় চড়ে নদীর দৃশ্য দেখা শেষ হয়েছে: তপ্ত রৌদ্রে মুখ রক্তিম হয়ে উঠেছে, সুতরাং বিশ্রাম বা যাত্রা বিরতি আবশ্যক। কর্মে বিরতি, ছড়ারও সমাপ্তি। ছড়ার এই অবয়বকে জীবের জন্ম-বৃদ্ধি-মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করা যায়। জন্ম-মৃত্যু প্রান্তসীমা, জীবনের বৃদ্ধি ও কর্মপ্রবাহ উভয়ের মধ্যাংশে সম্পন্ন হয়ে থাকে। আমরা এরূপ ছড়াকে আদর্শ ছড়া বলতে চাই।

আর একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে :

(৫) চাঁদ কোথা পাব, যাদুমণি!
মাটির চাঁদ না, গড়ে দেব,
গাছের চাঁদ না, পেড়ে দেব,
তোর মত চাঁদ কোথায় পাব।
তুই যে চাঁদের শিরোমণি।
ঘুমো রে আমার যাদুমণি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটি সংগ্রহ করেন। ছয় চরণের এই ছড়া একটি আবেগঘন পঙ্ক্তি দ্বারা সার্থকভাবে আরম্ভ হয়েছে। এখানে চাঁদ ও শিশু মুখ্য শব্দ। চাঁদের প্রসঙ্গ দ্বারা শিশুর ঘুমের উপযুক্ত পরিবেশ ও সময় সূচিত হয়েছে। চাঁদ স্নিগ্ধ আলো দান করে; তার সোনালী আভায় মনোমুগ্ধকর পরিবেশ রচিত হয়। চাঁদের প্রতি শিশুর মন সহজে আকৃষ্ট হয়। মা সে-সুযোগ নিয়েছেন। পরের চারটি চরণে চাঁদ শব্দের পুনরাবৃত্তি আছে। এগুলিতে চাঁদের অবস্থান এবং শিশু ও চাঁদের সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে। "ঘুমোরে আমার যাদুমণি।" বাক্যটি দ্বারা ছড়ার সমাপ্তি টানা হয়েছে। ছড়ার মূল লক্ষ তা-ই। পুরো ছড়াটি মায়ের উক্তি: শ্রোতা শিশু যাকে আদরার্থে 'যাদুমণি' বলা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ ভাবদ্যোতক এই ছড়া, আমাদের মতে, আদর্শ ছড়া।

(৬) দিদি গো দিদি,　　একটা কথা।
কি কথা ?　　ব্যাঙের মাথা।
কি ব্যাঙ ?　　সরু ব্যাঙ।
কি সরু ?　　বামন সরু।

কি বামন ? ভাট বামন।
কি ভাট ? চিকি গুয়া।
কি চিকি ? সোনার চিকি।
কি সোনা ? দুই খানা।
তার অর্ধেক ভাগ নে না॥

'দিদি'কে সম্বোধন করে অত্যন্ত আটপৌরে ভাষায় প্রশ্নোত্তরমূলক এই ছড়া আরম্ভ হয়েছে। তারপর প্রশ্ন; মনে হবে প্রশ্নের শেষ নেই। কিন্তু উত্তরদাতা এমন একটি স্তরে পৌঁছে যেখানে প্রশ্ন ফুরিয়ে যায়, ছড়াও থেমে যায়। প্রথম চরণে সূচনা আছে, পরবর্তী আটটি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছড়ার বিস্তার ঘটেছে, শেষ চরণে তা সমাপ্ত হয়েছে। এটিও একটি আদর্শ ছড়া; *এর কোন একটির অভাব হলে ছড়াটি অসম্পূর্ণ* হত। যেমন ১ ও ২ নং ছড়া সম্পূর্ণ, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বা আদর্শ ছড়া নয়। উভয়ের সূচনা ও সমাপ্তি আছে, মধ্যের বিস্তার নেই। যখন একটি ছড়ার জন্ম হয়, তখন রচয়িতা কোন না কোন রীতি অনুসরণ করেন; তাঁকে একটা কাঠামোতে ফেলে ছড়া নির্মাণ করতে হয়। ছড়ার এরূপ গঠন কাঠামো (structure) কি কি হতে পারে ? আমরা, এ যাবৎ যেসব ছড়া সংগ্রহ করেছি, সেসবের অবয়ব বিশ্লেষণ করে নিম্নরূপ কতকসূত্র নিরূপণ করতে পারি :

(১) আত্মকথন (Monologue)

সাধারণত এক বচন অথবা বহুবচন উত্তম পুরুষের উক্তি হিসেবে এরূপ ছড়া রচিত হয়।

(৭) তাই তাই তাই,
মামার বাড়ি যাই।
মামার বাড়ি দুধ-ভাত
পেট ভরে খাই॥ (মুর্শিদাবাদ)

(৮) ভিটের পরে শাক বুন্‌লাম,
শাক তর তর করে।
শাক বেচে শাঁখা কিন্‌লাম,
সতীন জ্বলে মরে॥
ও'ল আল্‌তা-কপালি,
তুই আমার ঝুংকা দেখালি ? (যশোর)

(৯) আমরা দুটি ভাই,
শিবের গাজন গাই।

মা গিয়াছেন গয়া-কাশী,
ডুগডুগি বাজাই॥ (যশোর)

ছড়াগুলোর বিষয় পরিবার-কেন্দ্রিক। ৭ ও ৯ নং ছড়ার শ্রোতা সমবয়সের ছেলে-মেয়ে, ৮ নং ছড়ার শ্রোতা সতীন। এতে সংলাপের ভাব আছে। ব্রত, মাগন ও ঐন্দ্রজালিক ছড়ায় উত্তম পুরুষের ব্যবহার বেশি হয়েছে। কেননা এসব ছড়ায় ব্যক্তির কামনা-বাসনা, ইচ্ছা, অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে।

(২) সংলাপ (Conversation/ dialogue)

সংলাপের ভঙ্গিতে রচিত বহু সংখ্যক ছড়া আছে। যখন ছড়া কাটা হয়, তখন সামনে কেউ না কেউ শ্রোতা থাকে। এজন্য ছড়াগুলো উক্তিমূলক হয়ে থাকে। ছেলেভুলান ছড়ায় শিশুকে এবং খেলার ছড়ায় প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে লক্ষ করে ছড়া কাটা হয়। এধরনের একোক্তি বা স্বগতোক্তিমূলক ছড়ার সংখ্যা বেশি। যেমন :

(১০) মাগো মা, বিয়ে দিলে না।
ঘোড়-গাড়িতে চড়ে যাব,
দেখতি পাবে না॥ (যশোর)

(১১) দাদা আমায় লোভ দেখায় -
তোর দেবো বিয়ে
সেই অবধি ম'লাম আমি,
নাড়ার বোঝা বয়ে॥ (যশোর)

দুই জন বা দুই পক্ষের সংলাপ-আকারে ছড়া আছে, তবে এরূপ সংখ্যা কম।

(১২) আমি তোমার কে ?　　তুমি আমার গঙ্গাজল।
আমি তোমার কে ?　　তুমি আমার জবাফুল।
তোমায় করব বে॥ (যশোর)

(১৩) আতাগাছে তোতা পাখী
ডালিম গাছে মৌ।
এত ডাকি, তবু কথা
কয় না কেন বৌ ?
কথা কবে কি ছলে,
কথা কতি গা জ্বলে॥ (যশোর)

ছড়া দুটি দ্বৈত-উক্তির ভঙ্গিতে রচিত। প্রশ্নোত্তরমূলক ছড়াগুলো প্রায় সবটাই সংলাপধর্মী। এতে অভিনয়েরও ভাব আছে। নিচের 'রাজার কোটাল' খেলার ছড়াটি অভিনয়ধর্মী।

(১৪) কান্‌টার পিছে কে ঘুর ? রাজার কোটাল।
কিসের জন্য ? এক ছড়ি কলার জন্য।
কাল যে লিয়া গেছিলা ? ঘোড়ায় মুত্যা দিয়াছে।
ধুয়্যা ধুয়্যা খাওনি ? ছি ! ছি ! হক থু !
তবে এক কাঁদি লিয়া যাও॥ (মুর্শিদাবাদ)

রাজার কোটাল এসেছে গৃহস্থের কাছে 'এক ছড়ি কলা'-র জন্য। কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর গৃহস্থ কলা দিতে সম্মত হয়। ছেলে-মেয়েরা গোল হয়ে বসে এবং পরস্পরের হাত একত্রে রাখে। এটাই কলার ছড়ি। একজন প্রধান গৃহস্থ সাজে; অপর জন 'রাজার কোটাল' সেজে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে এরূপ প্রশ্নোত্তরে অংশ নেয়। এখানেই অভিনয়ের আভাস আছে।

(৩) সম্বোধন/আহ্বান (Address/invitation)

মানুষ, মানবেতর প্রাণী, এমন কি, নৈসর্গিক বস্তুকে সম্বোধন করে ছড়া আরম্ভ হয় এবং সেই ভঙ্গিটি অনেকাংশে বজায় থাকে। পশু-পাখী, চাঁদ-সূর্যকে ভাই, মামা, ঠাকুর ইত্যাদি আত্মীয়তাবাচক শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা হয়। স্ত্রী সমাজে প্রচলিত গো, লো ইত্যাদি সম্বোধনসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়। আয়, আয়রে, ও, ওলো ইত্যাদি প্রচলিত সম্বোধনসূচক শব্দেরও ব্যবহার আছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল :

(১৫) ছোট বউ লো, বড় বৌ লো,
ঘাটে যাবি লো ?
পানির তলে ঘু ঘু ডাকে
শুনন্তি পাবি লো॥
বাঁশ বেয়ে পানি পড়ে,
ভিজে মলি লো।
কঞ্চি বেয়ে দুধ পড়ে,
চুষে খালি লো॥ (যশোর)

(১৬) আয় আয় চাঁদ মামা, টী দিয়ে যা।
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা॥
মাছ কুটলে মুড়ো দেব,
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব,
কাল গরুর দুধ দেব,
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা॥ (রবীন্দ্র-সংগ্রহ)

(১৭) মা গো মা, বিয়ে দিলে না।
রেলগাড়ীতে চাপে যাব, দেখতি পাব না॥ (খুলনা)

(১৮) আয় সোনার পাখী,
খাঁচায় বেন্দে রাখি।
কাল সকালে খুলে দেখি,
সেই সোনাতন পাখী॥ (খুলনা)

(১৯) লাল মেঘা ভাই, কাল মেঘা ভাই,
ফুটি ফুটি পানি দে, চিনার ভাত খাই।
খুড়ি খুড়ি পানি দে, ঘরে ভিজা যাই॥
ঘরে নাই ঠাঁই; কচু বনে যাই।
কচু বনে হাঁটু পানি, গড়াগড়ি যাই॥ (ফরিদপুর)

সম্বোধন ও আহ্বানের বৈচিত্র্য ও প্রভাব বুঝানোর জন্য সম্পূর্ণ ছড়া উদ্ধৃত হল। এগুলোকে ব্যক্তি 'আমি'র উক্তিরূপে গণ্য করা যায়। ১১ নং ছড়ায় 'চাঁদ'কে 'মামা' এবং ১৯ নং ছড়ায় 'মেঘ'কে 'ভাই' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। উভয় নৈসর্গিক বস্তু। স্ত্রীলোক সম্বোধনার্থে লো, গো, রে ব্যবহার করে থাকে। এগুলোর চর্চায় নারীদের ভূমিকাই মুখ্য। সম্ভবত ছড়াগুলো নারী দ্বারা রচিত হয়েছে।

(৪) গণনা (Enumeration)

ছড়ার অবয়ব নির্মাণে সংখ্যা এবং সংখ্যা-গণনা প্রভাব বিস্তার করে। কখনো একই সংখ্যার পুনরাবৃত্তি, কখনো সংখ্যার ক্রমিক গণনা রীতিতে ছড়ার চরণ রচিত ও বিন্যস্ত হয়। একটি ছড়া পাওয়া যায় উল্টো রীতিতে অর্থাৎ বেশি থেকে কমের দিকে গণনা করা হয়েছে। পৌষ সংক্রান্তিতে 'কুলাই ব্রতে'র একটি ছড়া এরূপ :

(২০) এক বাঘারে।
এক বাঘ চৈতা।

বাওন মার‍্যা নিলো পৈত্যা॥
এক বাঘের গলায় দড়ি।
হারা আট লড়ালড়ি॥
আর এক বাঘ হৈ চৈ।
গোয়াল মার‍্যা খাইল দৈ॥
আর এক বাঘ ছোপার আড়ে।
লাফ দিয়া পড়ে ধোপার ঘাড়ে॥ ...
আর এক বাঘ কাল্যা।
গাঙ্গের মারে জাল্যা॥
আর এক বাঘের মাথা কাটা।
ধান দেবারে কত কাঠা॥
বার বাঘের লেখা পড়ি।
চাউল দেও এক বুড়ি॥
ঠাকুর কুলাই ভোঁ॥ (বরিশাল)

ছড়াটি আংশিক উদ্ধৃত হল। এতে মোট ১২ টি বাঘের বর্ণনা আছে। 'এক', 'আর এক'- সংখ্যাবাচক শব্দের পুনরাবৃত্তি দ্বারা গণনা করা হয়েছে। ক্রমিক সংখ্যা আছে 'আহম্মকে'র তালিকা নির্ণয়ে। ছড়াটি এরূপ :

(২১) আহম্মক এক,
ছোট হইয়া বড় সাথে যে দেয় টেক।
আহম্মক দুই,
ঘর বাঁধিয়া যে না ধরে টুই।
আহম্মক তিন,
বড় হইয়া ছোটর কাছে যে করে ঋণ।
আহম্মক চাইর,
ঘরের কথা যে করে বাহির । ...
আহম্মক দশ,
যার থাকে নিশার বশ।
আহম্মক এগারর কথা বলব কি !
নিজ গাঁয়ে যে বিয়া দেয় আপন ঝি॥ (ঢাকা)

উল্টোভাবে গণনার রীতি অনুসৃত হয়েছে 'ষোল কৈ ষোলয়ে' ছড়ায়। স্বামী ১৬ টি কই মাছ বাড়ীতে এনেছে। খাবার সময় পাতে একটা কই মাছ দেখে সে স্ত্রীর কাছে মাছের হিসেব চায়। তখন স্ত্রী এভাবে গুণে মাছের হিসেব দেয় :

(২২) ষোল কৈ ষোলয়ে।
চার কৈ গেলে পালিয়ে॥
থাকে বার।
পাড়া-পড়শীকে দুইটা দিতে পারো॥
ঠেকলো দশে।
ধুতে বাছতে খসে॥
থাকে আট।
দুটা দিয়ে কিনেছি কাঠ॥
থাকে ছয়।
গুণধর ভাগ্নে দুটো খায়॥
থাকে দুই।
নিজের জন্য এক থুই॥
থাকলো এক।
চোখ থাকলে পাতে চেয়ে দেখ॥ (কুমিল্লা)

স্বামী-স্ত্রীর সংলাপ আকারে ছড়াটি বিন্যস্ত। অর্থাৎ গণনা ও সংলাপ উভয় রীতি এখানে অনুসৃত হয়েছে। গণনায় 'ষোল' থেকে 'একে' এসে শেষ হয়েছে। ছড়াটির পরিধি এই গণনার সংখ্যা দ্বারা নিরূপিত হয়েছে। এজন্য সংলাপ অপেক্ষা গণনার প্রাধান্য আছে এই ছড়ায়।

গণনার আর এক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে অন্য এক ছড়ায় :

(২৩) একটা আজার তিনটা গাঁও॥
তিনটা গাঁও যেমন-তেমন,
একটা গাঁওতে বসতে নাই।
যে গাঁওতে বসতে নাই,
ওইটা গাঁওতে বসিল্ তিনটা কুমার॥
তিনটা কুমার যেমন-তেমন,
একটা কুমারের হাতে নাই।
যেইটা কুমারের হাতে নাই,

ওইটা কুমার বেনাল তিনটা তাই॥ ...
তিনখান ঝাঁটি যেমন-তেমন,
একখান ঝাঁটির পটে নাই।
•যেখান ঝাঁটির পটে নাই,
ওইখান ঝাঁটিতে মারিল্ তিনটা উহি মাছ।
পুড়ে করল ছাই॥ (রংপুর)

ছড়াটি আংশিক উদ্ধৃত হল; মাঝের অংশে 'তিনটা তাই', 'তিনটা বাভন', 'তিনটা বলদ', 'তিন টাকা', 'তিনখান কোদাল', 'তিনটা চৌকা'-র বর্ণনা আছে। একই পদ্ধতিতে স্তবক বিন্যস্ত হয়েছে। স্তবকগুলোকে মনে হবে এক একটি তরঙ্গ; একই মাপের তরঙ্গ উঠছে, পড়ছে। মোট ৯টি এরূপ তরঙ্গ দ্বারা ছড়াটি রচিত হয়েছে। আগের দুটিতে উজান-ভাটির স্রোত-প্রবাহ আছে। স্রোত সমুদ্রে মিশে, তরঙ্গ কূলে আছাড় খায়। উৎস (পানি) এক, কিন্তু গতি-প্রকৃতি ভিন্ন। প্রকৃতির রূপ ও ছন্দ ছড়ার অবয়ব নির্মাণ করেছে। 'তিন' সংখ্যায় এক্সেল ওলরিক (Axel Olric) বর্ণিত 'তিনের অনন্য সূত্রে'র (the law of the Three) প্রভাব আছে। "শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যা দান।"-এ একই সূত্র কাজ করছে।

(২৪) বড় বৌর হাতে সরা,
পাড়ার লোকের প্রাণ-ভরা।
মেজো বৌ মেঝের মাটি,
সর্বকথায় ব'কে উঠি।
ছোট বৌ চুটনি,
পাড়ার লোকের কুটনি॥ (খুলনা)

এখানেও 'তিনের অনন্য সূত্র' সক্রিয়। বড়, মেজো, ছোট পরিমাপসূচক শব্দত্রয় ক্রমিক ধারায় তিনের সংখ্যাই সূচিত করে। "পিঠে খাবো, পুলি খাবো, আর খাবো লুচি। পায়েস খাবার বেলায় খাবো বাটি-বাটি।।" ছড়ায় 'খাবো' ক্রিয়াপদের ব্যবহারেও "তিনের অনন্য সূত্র' আছে। "খুচি দেবো, মুচি দেবো, দেবো মদন কড়ি। ইচ্ছে করে কিনে দেবো উচ্ছে পাড়ে শাড়ী।।" (খুলনা) এখানেও 'দেবো' ক্রিয়াপদের তিনবার পুনরাবৃত্তি আছে। 'তিনের অনন্য সূত্র' ছড়ার রূপ নির্মিতিতে কিরূপ প্রভাব ফেলে—এখানে তারও নিদর্শন আছে। উভয়ের ভাষা ও বিষয় ভিন্ন, কিন্তু গঠন-কাঠামোটি অভিন্ন।

(৫) তালিকা (List / series)

সমজাতীয় কোন কিছুর তালিকা প্রদানের প্রবণতা থেকে এরূপ ছড়া গঠিত হয়। এতে বিশেষ বিষয়, ঘটনা, গুণ বা ক্রিয়া পরপর উচ্চারিত হয়। উদাহরণ :

(২৫) যাদু এতো বড়ো রঙ্গ,
যাদু এতো বড়ো রঙ্গ।
চার কালো দেখাতে পার,
যাব তোমার সঙ্গ॥
কাক কালো, কোকিল কালো,
কালো ফিঙের বেশ।
তাহার অধিক কালো,
কন্যে, তোমার মাথার কেশ॥ (রবীন্দ্র-সংগ্রহ)

এভাবে 'চার ধলো', 'চার রাঙা', 'চার তিতো', 'চার হিম' ভিন্ন ভিন্ন স্তবকে বিন্যস্ত হয়েছে। চার কালো, চার ধলো ইত্যাদির গুচ্ছ তালিকা (series) আলম্বভাবে (horizontally) বর্ণিত হয়েছে। পাঁচ প্রকার বস্তুর এরূপ তালিকা একই ঢঙে, একই আঙ্গিকে উলম্বভাবে (vertically) বিন্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তালিকা প্রদানের চেতনা উভয় প্রকারে ক্রিয়া করেছে। ধাঁধাধর্মী ছড়াটি সম্ভবত একটি স্তবক দিয়ে শুরু হয়েছিল; পরে অন্য স্তবক রচিত হয়েছে। প্রতিটি স্তবকে প্রশ্নোত্তর আছে। স্তবকগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ।

(২৬) নারী ভালা বিমলা,
পানি ভালা অমলা।
গাছ ভালা নাগেশ্বর,
পুরুষ ভালা সাধু সদাগর।
ফল ভালা কলা,
রং ভালা ধলা।
গাই ভালা দুধালী,
বাড়ী ভালা পুবালী।
নাও ভালা পালুয়া॥ (সিলেট)

এটি বচনধর্মী ছড়া; এতে আট রকম 'ভালা' ব্যক্তি-বস্তুর ক্রমিক তালিকা (list)নির্মাণ করা-হয়েছে। তালিকার সংখ্যানুপাতে ছড়া ছোট-বড় হয়।

'দশ পুত্তল ব্রতে'র একটি ছড়া এরূপ :

(২৭) দশ পুত্তল পূজে যে,
দশফল পায় সে।
মরিয়ে মনুষ্য হব।
ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম লব।
সীতার মত সতী হব,
রামের মত পতি পাব,
লক্ষ্মণের মত দেবর পাব
কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাব,
দশরথের মত শ্বশুর পাব।
শিবের মত বাপ পাব,
লক্ষ্মী সরস্বতী বোন পাব,
কার্তিক গণেশ ভাই পাব।
লবকুশ ছেলে পাব,
কুন্তীর মত ধীরা হব,
দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব।
কলাবৌয়ের মত লজ্জাশীলা হব,
বিউলীর ডাল বর্ণ হব,
দুর্বার মত লতিয়ে যাব॥

এখানে দশ ফলের স্থলে ষোল ফলের বর্ণনা আছে। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ ও প্রকৃতি ছড়ার উৎস। হব, লব, পাব, যাব ইত্যাদি ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্য গঠিত হয়েছে। আদর্শবতী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে এই তালিকা তৈরী হয়েছে। সম্ভবত মূলে দশটি আকাঙ্ক্ষাই ছিল; তালিকা নির্মাণের প্রবণতা থেকে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৬) প্রশ্নোত্তর (Question-answer)

প্রশ্ন ও উত্তরের ভঙ্গিতে বহু সংখ্যক ছড়া রচিত হয়েছে। ছোট ছোট প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তরের মাধ্যমে ছড়া বেশ প্রলম্বিত হয়। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত বিষয় অথবা বিশেষ শব্দ ধরে পরের প্রশ্ন করা হয়। উত্তর এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যখন আর প্রশ্ন করার কিছু থাকে না, তখনই ছড়ার সমাপ্তি রেখা টানা হয়। কখনও প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা একই ব্যক্তি হয়ে থাকে, কখনও পৃথক ব্যক্তি হয়ে থাকে। দুই হাঁটু ভাঁজ করে পায়ের পাতার ওপর শিশুকে বসিয়ে দোল দিতে দিতে মা বা বোন ছড়া বলেন; এখানে প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা এক ব্যক্তি। যেমন

(২৮) ঘুঘ্ রে ঘুঘ্,
পেটে পুত।

কি ছেলে হল ?	ব্যাটা ছেলে হল।
ব্যাটা কই ?	মাছ ধরতে গেছে।
মাছ কই ?	চিলে নিল।
চিল কই ?	আলডালে বস্‌ল।
ডাল কই ?	ভেঙ্গে পড়ল।
কেমন করে ?	মড়ু মড়ু মড়ু মড়ু করে॥ (মুর্শিদাবাদ)

বস্তুত এরূপ ছড়ায় প্রশ্ন ও উত্তর উভয়ের সমান গুরুত্ব আছে। একটি অপরটিকে অনুসরণ করে উলম্বভাবে (vertically) বাড়তে থাকে। খেলার ছড়ায় প্রশ্নোত্তরের আঙ্গিকটি বেশী অনুসৃত হয়। ছড়া কাটা কোন কোন খেলার একটা অঙ্গ (part) হিসাবে বিবেচিত হয়। যেমন 'ঢেঁকি খেলা' হল হাত-পা ধরে কাউকে ঘুরানো; মূল খেলা আরম্ভ হওয়ার আগে ছড়া কাটা হয়।

(২৯) ঢেঁকি লো ?	কি লো ?
কনে যাস ?	বাদাবনে।
কি খাস ?	দুধ-কলা।
তোর বো'র নাম কি ?	খালই চিটে।
তোর শ্বশুরের নাম কি ?	পোড়া খেটে।
একটা ফড়িং ধরচিন্ ?	ফরর্‌র্॥ (যশোর)

এ-ধরনের ছড়া সংক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু অবসর বিনোদনের নিমিত্তে রচিত প্রশ্নোত্তরমূলক ছড়া বেশ দীর্ঘ হয়। এগুলোতে একে অপরকে ঠকানোর চেষ্টা করে। যখন ঠকানোর উপযুক্ত শব্দটি পেয়ে যায় তখনই অপমান বা নিন্দাসূচক শব্দটি বলে ছড়া শেষ করে। এ-ধরনের ছড়ায় সংলাপের ভঙ্গিটি অনুসৃত হয়।

(৭) গল্পমূলকতা (Story)

(৩০) ঘর জামাইয়ে পাও ধুইতে মিলে ভাংগা লুটা।
খাইবার কালে খালি কচুর ঘাটা॥
কচুর ঘাটা খাইয়া জামাইর পুছা অয় ভারী।
মনে মনে কয়, আইজ ছালুন করমু চুরি॥
রান্ধো ঘরো করমু চুরি হাড়ি।
গোয়াল ঘরো করমু চুরি ছাগল-বান্ধার দড়ি॥

হকল্‌তা চুরি করি করমু সর্বনাশ।
এর বাদে মুরুগ হাঁস॥
অধিক কথা বলতে সময় আমার নাই।
ঘর-জামাইর দুখের কথা ইতি দিয়া যাই॥ (সিলেট)

ছড়াটি যে গল্পের ভঙ্গিতে রচিত, তা শেষ চরণে স্পষ্ট বলা হয়েছে। 'ঘর-জামাইর দুখের কথা' মোট আটটি চরণে বর্ণিত হয়েছে। ঘর-জামাই সমাজে নিন্দার পাত্র; স্ত্রীর পৈতৃক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিত্বহীন এই সদস্যটি সম্মান পায় না—তাকে পা ধুতে ভাঙ্গা লোটা (ঘটি) এবং খেতে 'কচুর ঘাটা' (ঘণ্ট) দেওয়া হয়। ঘর-জামাই হলেও তার অপমানবোধ আছে: সে প্রতিশোধ নিতে তরকারী, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী চুরি করে শ্বশুরের সর্বনাশ করার সংকল্প ব্যক্ত করে। এরূপ সরল ঘটনার বর্ণনা আছে গল্পধর্মী এই ছড়ায়। এরূপ ছড়ায় গল্পরসের বাড়তি আনন্দ উপভোগের সুযোগ আছে।

(৩১) এক যে ছিল বনলতা।
বলি তার প্রেমের কথা॥
ভাতার ধরলি মাথা-ব্যথা।
সে ধরলি হাসির কথা॥
ভাতার ছেড়ে তাই ধরেছে,
কি কব তার কথা!
প্রেম করিল বনলতা॥ (যশোর)

(৩২) এক যে ছিল মাইয়ে!
ফিরতি লো সে নাইয়ে॥
পুকুড়-পাড়ে এক ভাল মান্‌ষির বিটা।
দাঁড়িয়েছিল তার জন্যি, জানতো না সে কিডা॥
মাইয়েডা কাছে আলি,
চোখে পড়ালো বালি।
মাইয়েড়ার হাত ধরে বিটা
মুখে দিইলো চুন-কালি।
কি করে মুখ দেখাবে ?
মাইয়েডা ফুলে ফুলে কাঁদবে॥ (যশোর)

(৩৩) এক যে ছিল শিয়াল,
বাপ দিইলো দিয়াল॥

দিয়ালের 'পরে বসে,
হুক্কো টানে কসে॥ (যশোর)

লোককাহিনী যেভাবে শুরু হয়, ছড়াগুলোও সেভাবে ও ভঙ্গিতে শুরু হয়েছে। ছেলে-মেয়ে একত্রে এ-ধরনের ছড়া আবৃত্তি করে অবসর বিনোদনের জন্য। তাঁরা একাধারে ছড়ার ও গল্পের আস্বাদন লাভ করে। যেহেতু ছোট ছেলে-মেয়ে এগুলোর চর্চা করে এবং যেহেতু এগুলো পদ্যে রচিত, সেহেতু এগুলোর ঘটনা সংক্ষিপ্ত, আকার ক্ষুদ্র হয়ে থাকে। পাশ্চাত্যের ছড়ার ভুবনে অনুরূপ দৃষ্টান্ত আছে। Humpty Dumpty sat on a wall./Humpty Dumpty had a great fall. All the King's horses and all the King's men./Cannot put Humpty Dumpty together again. এটি ডিম সম্বন্ধীয় ধাঁধাধর্মী ছড়া। এতে গল্পের আভাস আছে। ৩৩ নং ছড়ার কাঠামোর সাথে এর নিবিড় সম্পর্ক আছে। ৩২ নং ছড়া যেন একটি ছোটগল্পের আস্বাদন বহন করে। গ্রামের দুই কিশোর-কিশোরীর অস্বীকৃত প্রেম কেন্দ্রীয় বিষয়। পুকুড় পাড় প্রেম-নিবেদনের উপযুক্ত স্থান; গ্রামের তরুণ সে-সুযোগই গ্রহণ করে। কিন্তু অনভিজ্ঞ বালিকা তাতে সাড়া দিতে পারেনি; বরং হাতের স্পর্শে কলঙ্কিনীর অপবাদের ভয়ে সে কেঁদে ফেলে। এখানে আছে গল্পের ট্র্যাজিক ইফেক্ট। রচয়িতা এখানে ছড়ার আঙ্গিকে গল্পকে সার্থকভাবেই বেঁধেছেন।

(৮) বিবরণ (Description)

ঘটনা, ব্যক্তি, বিষয়, অবস্থার সাধারণ বর্ণনা দিয়ে ছড়া রচিত হয়েছে। এরূপ ছড়ার সংখ্যাই সর্বাধিক।

(৩৪) ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে আর বিলে।
সুন্দরীরে বিয়া দিলাম ডাকাতের মেলে॥
ডাকাত আলো মা।
পাট কাপড় দিয়ে বেড়ে নিলে, দেখতে দিলে না॥
আগে যদি জানতাম,
ডুলি ধরে কানতাম॥ (রবীন্দ্র-সংগ্রহ)

(৩৫) ফুলি ফুল তুলতে যায়।
ফুলি রাঙ্গা ভাতার চায়॥
পা দিলি ফুলি, থুব্বে আছাড় খায়॥ (খুলনা)

(৩৬) ওপারেতে কাল রঙ,
বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্।
এ পারেতে লঙ্কা গাছটি, রাঙা টুক টুক করে।
গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে॥
এ মাসটা থাক দিদি, কেঁদে ককিয়ে।
ও মাসেতে নিয়ে যাব পাল্কি সাজিয়ে॥ (রবীন্দ্র-সংগ্রহ)

৩৪ নং ছড়ায় ঘটনার, ৩৫ নং ছড়ায় ব্যক্তির এবং ৩৬ নং ছড়ায় অবস্থার বর্ণনা আছে। সুন্দরীর বিয়ের ঘটনা— ঢাক বাজিয়ে বর এল, পাটের শাড়ী পরিয়ে বিয়ে হল, পাল্কিতে চড়ে চলে গেল। সুন্দরীকে বিদায় দিয়ে মার হৃদয় মোচড় দিয়ে উঠেছে—যেন মুহূর্তেই সব কিছু ঘটে গেল, মা কান্নার সময় পেল না। মেয়ের বিচ্ছেদে মাতৃহৃদয়ের শূন্যতা ও বেদনা হাহাকার করে উঠেছে। সম বয়সের মেয়েরা 'ফুলি'কে ব্যঙ্গ করেছে বটে, কিন্তু ফুলির ফুল তোলার ও স্বামী হিসেবে একজন রঙীন পুরুষের প্রত্যাশাও ব্যক্ত হয়েছে। অল্প কথায় অধিক বক্তব্য ছড়ার বৈশিষ্ট্য। সময় ও স্থানের দূরত্বকে কমিয়ে এনে প্রতিপাদ্য বিষয়কে ছড়াকার অনায়াসে ব্যক্ত করতে পারেন। এখানে ছড়ার সেই শক্তি আছে যাতে 'বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ' পাওয়া যায়। ছড়াকারই বর্ণনার ভূমিকায় থাকেন। ৩৪নং ছড়ায় শেষ দুই চরণে মায়ের উক্তি এসেছে। ৩৬ নং ছড়াটিতে ভাই-বোনের সংলাপ আছে। তবে প্রথম চারটি চরণ বর্ণনামূলক। বলা যায়, এ-ধরনের ছড়ায় বর্ণনা, উক্তি, সংলাপ - মিশ্ররীতির প্রভাব আছে।

(৯) ধ্বন্যাত্মক শব্দগুচ্ছ (Onomatopoeia)

ছড়ার ছন্দলালিত্য, ধ্বনিসৌন্দর্য, চিত্ররস আকর্ষণীয় গুণ। চোখের তৃপ্তির জন্য চিত্রসৌন্দর্য এবং শ্রুতির তৃপ্তির জন্য ধ্বনিমাধুর্য আবশ্যক হয়। এই শ্রুতি সুখকর ধ্বনিচেতনা থেকে পদ্যে অন্ত্যমিল, অনুপ্রাস অলংকার সৃষ্টি হয়। ড. সুকুমার সেন বলেন, মিলের টানে টানেই ছড়ার এক একটি পঙ্ক্তি বেড়ে ওঠে এবং এক সময়ে শেষ হয়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি "এক যে ছিল শেয়াল,/তার বাপ দিল দেয়াল।" ইত্যাদি ছড়ার উল্লেখ করেন।[৫] অন্ত্যমিল ধ্বনিরই টান। এই ধ্বনির টানে-টানে চরণ গড়ে ওঠে। ধ্বনির টান চরণ থেকে চরণান্তরে সঞ্চারিত হয়ে ছড়ার প্রবহমানতা বজায় রাখে। ধ্বন্যাত্মক শব্দ দ্বারা অনেক ছড়ার সূচনা হয়: যেমন "ইকড়ি মিকড়ি চাম চিক্‌ড়ি।" "উলুকুটু ধুলুকুটু নলের বাঁশী।" "আঁটুল বাঁটুল শামলা শাঁটুল।" "খড়কেরে মড়কেরে গবর ঘুটে দেরে।" ইত্যাদি। এগুলো

অর্থহীন ধ্বন্যাত্মক শব্দ; অর্থযুক্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার আছে পূর্বোক্ত ৩৬ নং ছড়ায়— ঝম্‌ঝম্, টুক্‌টুক্ এরূপ ধ্বন্যাত্মক শব্দ। অপর একটি ছড়া এরূপ :

(৩৭) হাড় কট্‌কট্, হাড় কট্ কট্,
প্রাণ কট্ কট্ করে।
সেই যে গেছে সেই মানুষডা,
আর আসিনি ঘরে॥
হাত টন্ টন্ হাত টন্ টন্,
মন টন্ টন্ করে।
কবে আমার প্রাণের মানুষ
আসবে আমার ঘরে॥
ঘুম হয় না, ঘুম হয় না,
বালিশ মাথায় দিয়ে।
আসবে কবে রাত পেয়ালি
যাবে আমায় নিয়ে॥ (যশোর)

এখানে কট্ কট্, টন্ টন্ ধ্বনি-তরঙ্গ দ্বারা চরণ গঠন করে সমগ্র ছড়ায় প্রাণ ও গতি সঞ্চার করেছে। ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। অনুপ্রাস সৃষ্টির প্রবণতা থেকে গঠিত হয়েছে নিম্নের ছড়াটি :

(৩৮) চাপিলা চুপিলা,
ঘন ঘন মাজিলা।
শালের হুক্কা, নলের বাঁশি,
নল ঘুরাইতে একাদশী।
একা নলের বেঁকা ফুল,
কে কে যাইবে গাঙের কুল ?
গাঙের কূলে উঠছে পানি,
ভাই-এ বোনে টানাটানি॥

প্রথম দুটি চরণে 'লা' ধ্বনি তিনবার এসেছে। পরের তিনটি চরণে 'নল' শব্দের পুনরাবৃত্তি হয়েছে; ৬ষ্ঠ ও ৭ম নং চরণে 'গাঙ' ও 'কূল' শব্দের দ্বিরুক্তি আছে। ৭ম ও ৮ম চরণে 'ন' ধ্বনি চার বার উচ্চারিত হয়েছে। 'চাপিলা চুপিলা' ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

শব্দগত ধ্বনিব্যঞ্জনা আছে "দোল দোল দোলানি,/কানে দেব চৌদানি।" "ধন ধন ধনিয়ে, কাপড় দেব বুনিয়ে।", "ধন ধোনা ধন ধোনা,/চোত-বোশেখের

বেনা।"- ইত্যাদি ছড়ায়। শিশুর মনোরঞ্জন-নিমিত্তে রচিত বলে কোমল ন, ল ধ্বনি প্রাধান্য পেয়েছে। কর্কশ বা রূঢ় ধ্বনি বা ধ্বনিচিত্র (zebus) শিশুতোষ ছড়ায় নেই।

(১০) পুনরুক্তি (Repitition)

শব্দ অথবা শব্দগুচ্ছের পুনরুক্তি দ্বারা ছড়ার কায়া গঠন করা হয়, এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। একই শব্দ চরণে ও চরণান্তরে একাধিক বার ব্যবহৃত হয়েছে, তার নমুনা এরূপ :

(৩৯) হরম বিবির খড়ম পায়।
লাল বিবির জুতা পায়॥
চল্ লো বিবি ঢাকা যাই,
ঢাকা গিয়ে ফল খাই।
সে ফলের বোঁটা নাই॥ (রবীন্দ্র-সংগ্রহ)

'বিবি' পরপর তিনটি চরণে, 'ঢাকা' ও 'ফল' দুটি চরণে পুনরাবৃত্ত হয়ে ছড়াকে বিস্তৃতি ও প্রবহমানতা দান করেছে।

(৪০) সতীন সতীন ফুলের মালা।
সতীন হল বড় জ্বালা॥
সতীন গেল শাক তুলতি,
সাপে দেল পা।
সত্যপীরের সাপ হইস্ ত,
সতীন ধরে খা॥ (যশোর)

'সতীন' শব্দটি পুরো ছড়াকে বেষ্টন করে আছে; ছড়ার কেন্দ্রীয় ভাবটি ওই পদের ওপর সমর্পিত। অনুরূপভাবে ২৫ নং ছড়ার 'যাদু এতো বড় রঙ্গ' শব্দগুচ্ছ (cliche) চরণে এবং স্তবকে পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

(১১) অনুষঙ্গ (Association)

ছড়ার অবয়ব নির্মাণে সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এক শব্দের টানে আরেক শব্দ এসে চরণকে প্রসারিত ও গতি দান করে। যেমন বাপ-মা, ভাই-বোন, মাসী-পিসী, সহচর শব্দ; আসা-যাওয়া, আজ-কাল, উঁচু-নীচু, আগা-গোড়া প্রতিচর শব্দ। এগুলো প্রায়শ যুগ্মকরূপে ছড়ায় ব্যবহৃত হয়। এমন কি লোকসাহিত্যের অন্য শাখাতেও এরূপ যুগ্মকের ব্যবহার আছে।

প্রথমটি সমধর্মী যুগ্মক (binarism), দ্বিতীয়টি বিষমধর্মী যুগ্মক (antithesis)। সোনা-রূপা, আলতা-পান, জল-তেল ইত্যাদি অনুচর শব্দ রূপে গণ্য করা হয়।

পূর্বে উল্লিখিত ১৩ নং ছড়ায় আতা গাছ ও ডালিম গাছ, তোতা পাখী ও মৌমাছি অনুচর শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। গাছ থাকায় তার অনুষঙ্গে পাখী ও মৌমাছি এসেছে। ছড়াটির কেন্দ্রীয় বিষয়—এক অভিমানক্ষুব্ধ বধূর প্রেম। লোক-সাহিত্যে বিবাহ, প্রেম, যৌন ইত্যাদি বিষয়ে প্রতীকরূপে পাখী, গাছ, ফুল, ফল ব্যবহৃত হয়। এখানে আতা গাছ, ডালিম গাছ, তোতা পাখী, মৌমাছির চিত্র এসেছে মূলভাবের প্রতীকদ্যোতক হিসেবে। সুতরাং ছড়াটিতে শব্দানুষঙ্গ (association of words) এবং ভাবানুষঙ্গ (association of ideas) উভয়ের প্রভাব আছে। ছড়ার মৌলিক ও সম্পূরক প্রতিসাম্য (symmetry) এভাবেই গঠিত ও রক্ষিত হয়। নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেন, "সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দ লোক- সাহিত্যের ভাষাগত দিকের একটি প্রধান উপকরণ—শব্দগুলি জোড়-বাঁধা থাকে, একটি এলেই নানাভাবে তার আর একটি আসবেই। এই ভাবে তৈরী হয় একটি নিয়ম-মাফিক মিল, যা একটি নকশা বা প্যাটার্নকে নির্দেশ করে। ... হয় প্রতীক বা ওই জাতীয় কোনো বন্ধনে, নয় ভাষাগত বন্ধনে এগুলি বাঁধা। তাই একটি ব্যবহৃত হলেই আর একটিও হয়।"৬

(৪১) আগের নৌকা, পাছের নৌকা,
　　নৌকা সারি সারি।
মাঝের নৌকায় চড়ে যাবো
　　লাল বিবির বাড়ি॥
লাল বিবি পান খেয়ে
　　পথে ফেলবে চিপ্।
আবদুল মোল্লা দেখতি পারলি
　　চোখে মারবে টিপ্॥ (যশোর)

এখানে 'নৌকা' শব্দের চার বার পুনরাবৃত্তি আছে। 'আগের নৌকা' ও 'পাছের নৌকা' জোড়পদে দিক-সূচক বিরোধমূলকতা (antithesis) আছে। আগে ও পাছে 'প্রতিচর শব্দ'; দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণদ্বয় 'লাল বিবি' পদের পুনরাবৃত্তি দ্বারা সংযুক্ত হয়েছে। নারী-পুরুষের সহচর হিসাবে লাল বিবি ও আবদুল মোল্লার সহাবস্থান। টিপ্ মারায় প্রণয় নিবেদনের ইঙ্গিত আছে। নৌকা ও পানে আছে তারই প্রতীক-ব্যঞ্জনা। এ দিক থেকে ছড়াটি সুগ্রথিত ও সুবিন্যস্ত।

(১২) ক্রমপুঞ্জতা (Cumulativeness)

কতক লোককথা আছে যেগুলোর সার-সংক্ষেপ ছড়ায় ক্রমপুঞ্জিত হয়। 'কাক ও চড়ুই' এরূপ একটি বহুল প্রচলিত লোককাহিনী। কাক চড়ুই-এর বুক খাবে, চড়ুই কাককে তার নোংরা ঠোঁট ধোয়ার শর্ত দেয়। কাক নদীর কাছে যায়, নদী তাকে ঘটি আনার কথা বলে। কাক কুমারের কাছে যায়; কুমার তাকে মাটি আনতে বলে। কাক মাটির কাছে গেলে সে. তাকে শিং আনতে বলে । কাক মহিষের কাছে গেলে সে লড়াই-এর জন্য কুকুর আনতে বলে। অনুরূপ ভাবে কুকুর গরুর দুধ আনতে, গরু ঘাস আনতে, ঘাস কাচি আনতে, কামার আগুন আনতে বলে। শেষে গৃহস্থের কাছ থেকে আগুন নিয়ে ফেরার পথে কাক সে-আগুনে পুড়ে মারা যায়। এই গল্পটির প্রতিটি স্তরের ঘটনা একটি ছড়ায় ক্রমপুঞ্জিত হয়েছে এভাবে :

(৪২) গিরছ রে গিরছ -
দিতা আগুন, ধরাইত্ তাও,
বানাইত কাচি, কাটত ঘাসি,
খাইত গাভী, দিত দুধু,
খাইত কুতু, অইত লুতু,
মারত ভইষা, নিতাম শিঙা,
খুঁড়ত মাটি, বানাইত ঘটি,
তুলতাম পানি, ধুইতাম ঠোঁট,
তবে খাইতাম চড়ুইর বুক॥[৭] (ময়মনসিংহ)

এটি গৃহস্থের কাছে কাকের উক্তি। পুরো গল্পের পটভূমি জানা না থাকলে ছড়ার অর্থাগম সহজ হয় না। আমাদের বিশ্বাস, চিত্রবহুল ছড়ার পটভূমিতে কোন না কোন গল্প আছে। গল্পটি জানা না থাকলে ছড়াটি অসংলগ্ন ও দুর্বোধ্য মনে হয়।

টুনটুনিকে শায়েস্তা করতে গিয়ে রাজা কিভাবে নাস্তানাবুদ হয় তার কথা আছে 'টুনটুনি' গল্পে। টুনটুনি রাজার কড়ি চুরি করে; রাজা তাকে ধরে ভাজি করে খেয়ে তাকে শাস্তি দিতে চান। টুনটুনির বুদ্ধিমত্তার জন্য উল্টো রাজা শাস্তি ভোগ করেন। প্রথমে সাত রানীর এবং পরে স্বয়ং রাজার নাক কাটা যায়। টুনটুনির স্থলে ব্যাঙ ভাজা খাওয়ায় রাজার নির্দেশে রানীদের নাক কাটা যায়। একটি ছড়ায় গল্পটি এভাবে ক্রমপুঞ্জিত হয়েছে

(৪৩) বাহবা কি মজারে!
নাক কাটা রাজা রে।

টুনির গোশত খেতে গিয়ে
খেলো ব্যাঙ ভাজারে।
সাত রানীর গেল নাক কাটা
কেমন রাজার সাজারে॥[৮] (টাঙ্গাইল)

'টোনার চাতুরীর কিস্‌সা'র ক্রমপুঞ্জি ছড়াটি এরূপ :

(৪৪) গুদ কাইডা ক্ষুর পাইলাম;
টাক ডুমা ডুম্ ডুম্।
ক্ষুর ভাইঙ্গা টোয়া পাইলাম,
টাক ডুমা ডুম্ ডুম্।
টোয়া ভাইঙ্গা গাই পাইলাম,
টাক ডুমা ডুম্ ডুম।
গাই মাইরা বৌ পাইলাম,
টাক ডুমা ডুম্ ডুম।
বৌ মাইরা হুরুম পাইলাম,
টাক ডুমা ডুম্ ডুম।
হুরুম দিয়া ঢুল পাইলাম,
টাক ডুমা ডুম্ ডুম।
নাচতে নাচতে বাড়ী গেলাম,
টাক ডুমা ডুম্ ডুম।
তেরে কেটে টাক ডুমা ডুম্ ডুম॥[৯]

টোনা পাখীর পশ্চাৎদেশে কাঁটা ফুটলে সে নাপিতের কাছে যায়। নাপিত কাঁটা তুলতে গিয়ে মাংস কেটে ফেলে। টোনা সালিসীর ভয় দেখালে ক্ষুর দিয়ে আপোষ-রফা হয়। এরূপ ক্ষুরের বদলে হাটুরের কাছ থেকে মাটির ভাড়, ভাঁড়ের বদলে পাইকারের কাছ থেকে গাভী, গাভীর বদলে গৃহস্থের কাছ থেকে তার বউ, বউয়ের বদলে মুড়ি, মুড়ির বদলে ঢোল লাভ করে। এখানে মোট ৬টি ঘটনার সমাহার আছে। ঘটনাগুলো এক একটা পঙ্‌ক্তিতে বাণীবদ্ধ ও বিন্যস্ত হয়েছে।

ছড়ার, রূপ ও গঠন প্রকৃতিতে প্রভাব বিস্তার করে এমন বারটি প্রক্রিয়ার কথা বলেছি। এগুলোর একটি বা একাধিক মিশ্র প্রক্রিয়ায় ছড়া গঠিত হয়, আলোচনা-প্রসঙ্গে সে সম্পর্কেও আলোকপাত করেছি। এক এক প্রক্রিয়ায় ছড়ার এক একটি কাঠামো গড়ে উঠেছে। ছড়া যখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ (migrate) করে তখন কালিক ও স্থানীয় ঐতিহ্য (tradition) ও পরিবেশের (ecology)

প্রভাবে বাণীর হেরফের হয়, কিন্তু কাঠামোটি প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। যে-কোন ছড়ার 'কথান্তর' (variant) বিচার করলে তা বুঝা যায়। একটি দৃষ্টান্ত দিই :

(৪৪) অন্নপূর্ণা দুধের সর,
কাল যাব লো পরের ঘর।
পরের বেটা মারলে চড়,
কানতে কানতে খুড়োর ঘর।
খুড়ো দিলে বুড়ো বর॥ (রবীন্দ্র-সংগ্রহ)

কথান্তর : (ক) ওরে পরাণ দুধির সর,
কেমন করে করব ঘর।
পরের বেটা মারলে চড়,
কেন্দে কেটে সেই ঘর॥ (যশোর)

(খ) মেয়ে আমার দুধের সর,
কেমনে করব পরের ঘর।
পর বেটারা গাইলেবী,
কাঞ্চি বসে কাঁদবি।
কাঞ্চি আছে জিকের ডাল,
তাইতে তুলবি পিঠের ছাল॥ (ফরিদপুর)

কথান্তরে ভাষায় ও বক্তব্যে বেশ পরিবর্তন এসেছে; (ক) সংখ্যক ছড়ায় প্রতিবাদ নেই, শুধু কান্নাই সার; মূলে সামান্য প্রতিবাদ আছে—খুড়োর ঘরে প্রত্যাবর্তন; (খ) সংখ্যক ছড়ায় প্রতিবাদ আরও তীব্র ও তুল্যমূল্য। মারের বদলে মার—সম-অধিকার চেতনা ও মর্যাদাবোধের ফল তা। কিন্তু ছড়ার গঠন-কাঠামোতে একটুও পরিবর্তন আসেনি। (ক) সংখ্যক ছড়াটি মায়ের স্থলে মেয়ের উক্তি বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু তাতেও কাঠামোগত কোনরূপ পরিবর্তন ঘটেনি। নোয়াম চমস্কি কথিত এটাই 'গভীর কাঠামো' (deep structure)। সঙ্গীতে সুরের কাঠামো (musical structure) অপরিবর্তিত থাকে, বাণী পাল্টায়। সুরের কাঠামো আয়ত্ত করে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ইসলাম কীর্তন, সারি, ভাটিয়ালী, বাউল, ঝুমুর ইত্যাদি গান রচনা করেন। এমন কি, ভাষান্তরেও সুরের কাঠামোর হেরফের হয় না। হিন্দী-উর্দু গজল, কাওয়ালী, ভজন বাংলা গানে স্থান করে নিয়েছে। ছড়ার আন্তঃকাঠামোটিও সাধারণত অটুট থাকে।

এবার ছড়ার সঠিক সমীক্ষার (rounded study-র) কথা বলা যায়। একে মূলত শব্দতাত্ত্বিক (syntactic) ও অর্থতাত্ত্বিক (semantic) বিশ্লেষণ বলা

যায়। নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেছেন, ছড়ার একটি পঙ্‌ক্তি গঠন এবং একটি পঙ্‌ক্তির সাথে অপর পঙ্‌ক্তির অন্বয় অনুসন্ধানের মধ্যে এরূপ সমীক্ষার তাৎপর্য নিহিত আছে। তিনি একটি পঙ্‌ক্তির সমীক্ষাকে 'মৌলিক প্রতিসাম্য' (primary symmetry) এবং সমগ্র পঙ্‌ক্তির সমীক্ষাকে 'সম্পূরক প্রতিসাম্য' (secondary symmetry) বলেছেন। সাধারণ শব্দ (যেমন— নদী, পুকুর, পান, পাখী, বিয়ে, গান ইত্যাদি) এবং ভাষাতত্ত্বিক বিশেষত্ব (যেমন— শব্দ দ্বৈত, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দ, মিলের বন্ধন-রীতি, যুগ্মক, বিরোধিতা ইত্যাদি) একত্রে মিলে একটি বা জোড় পঙ্‌ক্তি রচনায় ভূমিকা নিয়ে থাকে। এর গতি আলম্বিত (horizontal)। শব্দের বা শব্দগুচ্ছের পুনরুক্তি, আন্তঃ ও অন্ত্যমিল-রীতি, প্রশ্ন-উত্তর, কার্য-কারণ-সূত্র, প্রতীক ও মিশ্র প্রতীক (composite symbol) ইত্যাদির সন্নিবেশে পঙ্‌ক্তিচয়ের একীকরণ (unifying) ঘটে। এর ফলে, লক্ষ করা যায়, ছড়ার চরণগুলো পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত ও অর্থবহ হয়। তাঁর মতে ছড়ায় অসংলগ্ন, অসঙ্গতি বলে কিছু নেই। আপাতদৃষ্টিতে যা অসঙ্গতিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়, সঠিক সমীক্ষায় তার অন্তর্নিহিত রহস্য জানা যায়।[১০]

(৪৫) আয় রে আয় টিয়ে।
নায়ে ভরা দিয়ে॥
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে।
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে॥
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা।
খোকার নাচন দেখে যা॥ (রবীন্দ্র-সংগ্রহ)

এটি ছেলে ভুলানো ছড়া; শিশুকে হাঁটতে শিখানোর সময় এরূপ ছড়া বলে তাকে উৎসাহ জোগানো হয়। 'আয় রে আয়' ছড়ার আহ্বানসূচক একটি মটিফ; টিয়া পাখিবাচক সাধারণ শব্দ। নৌকায় চড়ে টিয়ার আগমন প্রত্যাশা করা হয়েছে। টিয়ার সাথে নৌকার সম্পর্ক কি ? ছড়ায় পাখি, নদী, পুকুর, জল, গাছ, ফুল অনুচরশব্দ রূপে একটার টানে অপরটি আসে। নৌকার পটভূমিতে নদী আসে। পাখি ও নদীর অনুকল্পে টিয়া ও নৌকা এসেছে। জোড় পঙ্‌ক্তি মিলে মৌলিক প্রতিসাম্য রচনা করেছে। তৃতীয় চরণে না <নৌকা শব্দের পুনরাবৃত্তি দ্বারা সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। নৌকা-নদীর প্রসঙ্গ থেকেই বোয়াল মাছ এসেছে। এটিও অনুচরশব্দ। ভোঁদড় জলচর জীব। সুতরাং বোয়াল মাছ ও ভোঁদড়ের সহাবস্থান সহচর শব্দ হিসেবে। পঞ্চম চরণে ভোঁদড় শব্দের পুনরাবৃত্তি আছে। অনুচর-সহচর শব্দ এবং একই শব্দের পুনরাবৃত্তি দ্বারা একীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সুতরাং

ছড়াটির মধ্যাংশ রূপতত্ত্বের বিচারে স্বাভাবক ও সঙ্গতভাবে সম্পৃক্ত ও সুবিন্যস্ত। "খোকার নাচন দেখে যা।" সমাপ্তিসূচক শেষ চরণটিও সুচারুরূপে গ্রথিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। এর দ্বারা ছড়াটি চূড়ান্তরূপে পরিণতি লাভ করেছে। সুতরাং ছড়ার অবশিষ্ট পঙ্ক্তিসমূহ মিলে যথার্থভাবে সম্পূরক প্রতিসাম্য (secondary symmetry) রচনা করেছে। আদি-মধ্য-অন্ত্য অংশের সমন্বয়ে গঠিত এই ছড়া আঙ্গিক বিচারে একটি নিখুঁত ও আদর্শ ছড়ার দৃষ্টান্ত বহন করে।

তথ্য-সঙ্কেত :

১. মৎ প্রণীত, *বাংলা লোকসাহিত্য* : মন্ত্র, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৮

২. করুণাময় গোস্বামী, *সঙ্গীতকোষ*, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৩৫৪

৩. উদ্ধৃত, নির্মলেন্দু ভৌমিক, *বাঙলা ছড়ার ভূমিকা*, কলিকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ৩৫

৪. ঐ, পৃ. ১৩৮-৩৯

৫. *বাঙলা ছড়ার ভূমিকা*, পৃ. ৩৫

৬। ঐ , পৃ. ৩৭

৭। রওশন ইজদানী, *মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৫৮

৮। আশরাফ সিদ্দিকী, *লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড*, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ২৪৭-৪৮

৯। *লোকসাহিত্য সংকলন, ৪২ শ খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২৩। টোয়া—ভাঁড় (মাটির পাত্র); হুরুম—মুড়ি

১০। *বাঙলা ছড়ার ভূমিকা*, পৃ. ১৩৩-৪২